Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 63 - 69
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 63 - 69
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মনোজ বসুর ছোটগল্পে বিবাহ-পূর্ব প্রেম

সৌমেন মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া
Email ID: soumen1804@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Inexpressive, youthful, masculine, self-selected, romance..

Abstract
The premarital love stories of Manoj Bose are socially healthy and wholesome. The author explores the extraordinary in the ordinary form of love in these stories mainly set in the village life. There are many different expressions of love in the stories of this stage. Some stories show one loved the other, but was not loved in return. In some stories the two love each other. And in some stories, one is deceived by love. Apart from these three, there are other types of stories at this stage which Manoj Bose has given an opportunity to make a love story completely but has given them a different dimension with wilful negligence. As a result, those stories written in an atmosphere of love ended up being anti-romantic. But above all, as a romantic writer, Manoj Bose wants to spread the reader's love for life through these stories. So the sweetness of love is magnified in his stories. Complex psychoanalysis has no place there. Instead, some idealistic aspects of love have emerged, such as falling in love without getting love, sacrificing self-happiness for love, surrendering to masculinity ignoring wealth, etc. All in all, Manoj Bose's premarital love stories have managed to establish a specialty.

Discussion

বিশ শতকের একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তিনি অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর থানার ডোঙাঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সময়ে বাল্য-কৈশোর কাটিয়ে তিনের দশকে তিনি লেখক হিসেবে জীবন শুরু করেন। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমকালে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও ‘কল্লোল’-গোষ্ঠীর লেখকদের মতো পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হাহাকার নিয়ে ব্যর্থ জীবনের কোন ছবি আঁকেননি তিনি। ‘কল্লোল’-এর নগরকেন্দ্রিকতা ও ভাঙন ধরা মূল্যবোধ থেকে দূরে এক স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তিনি পদসঞ্চার করেছেন। তাঁর গল্পসম্ভারে নানা শ্রেণির গল্পের মধ্যে প্রেমের গল্প রয়েছে সর্বাধিক। প্রেম বিষয়ক গল্পগুলি রচনা করতে গিয়ে তিনি বিবাহ-পূর্ববর্তী ও বিবাহ-পরবর্তী উভয় পর্বকে অবলম্বন করেছেন।

প্রেমের প্রকাশভঙ্গির নিরিখে তাঁর বিবাহপূর্ব প্রেমের গল্পগুলি মূলত চারটি কোটিতে বিন্যস্ত – ১. একমুখী প্রেমের গল্প, ২. দ্বিমুখী প্রেমের গল্প, ৩. ভন্ড প্রেমের গল্প এবং ৪. অ্যান্টি-রোমান্টিক গল্প। আমরা এখন এই বিন্যাসের বাতাবরণে কিছু প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প আলোচনা করে দেখব বিবাহ-পূর্ব প্রেমের গল্পগুলিতে প্রেম সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ভাবনা কীভাবে রূপায়িত হয়েছে।

প্রেম হল নর ও নারীর একে অন্যের প্রতি এক অপরিণামদর্শী মুগ্ধতা। এই মুগ্ধতা শুধু সমবয়সী নয়, অসমবয়স্ক মানুষের প্রতিও তৈরি হয়। এর প্রকাশও সব সময় সহজ বা সম্ভব হয় না। ফলে তা অবরুদ্ধ বেদনার জন্ম দেয়। সহ্যের অতীত হয়ে উঠলে কখনো কখনো তার নিরুপায় প্রকাশ ঘটে। ‘উপসংহার’ গল্পে এক কবিতাপাগল যুবকের প্রতি এক কিশোরীর এমনই প্রকাশকুণ্ঠিত একমুখী প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে কাত্যায়নী ওরফে কাতুর হৃদয়ের মধুর উত্তাপ প্রকাশ পেয়েছে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে জনার্দনের বাড়ি যাতায়াতের সূত্রে নবগোপালের সাথে জনার্দনের বালিকা-কন্যা কাতুর অসমবয়সী আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। পাঁচ বছর পরে কাতু কিশোরী হয়ে উঠলে জনার্দন মোটা কন্যাপণ পাওয়ার লোভে দোজবর অবিনাশের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির করে। আত্মভোলা নবগোপাল কিশোরী কাতুর মনের খবর বিন্দুমাত্র রাখে না। তাই এই বিয়ে উপলক্ষ্যে নবদম্পতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে নবগোপাল একটি পদ্য লিখে কাতুকে শোনালে সে পদ্যের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে এবং “তুমি যদি পদ্য ছাপাও আমি গলায় দড়ি দেব – কী করেছি আমি তোমার?”[১] বলে কান্না চাপতে চাপতে ছুটে চলে যায়। এই প্রতিক্রিয়া আপাত অসঙ্গত হলেও এর মধ্য দিয়ে কিশোরী কাতুর অবরুদ্ধ ভালোবাসা তীব্র ও তির্যকভাবে আভাসিত হয়েছে।

অসমবয়সী একমুখী প্রেমের আরেকটি বেদনাপূর্ণ রূপ দেখা যায় ‘রায়রায়ানের দেউল’ গল্পে। যৌবনে স্ত্রীকে হারিয়ে রামেশ্বর বৈমাত্রেয় ভাই মধুকরকে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বের হন। কুড়ি বছর পরে তিনি জায়গিরদার ‘রায়রায়ান’ হয়ে ফেরেন। জায়গির দখলের লড়াইয়ে পরাজিত তপন রায়ের স্ত্রী ও কন্যা মঞ্জরীকে রায়রায়ান বন্দী করেন। জীবনসায়াহ্নে নতুন করে নীড় গড়বার সাধ নিয়ে মঞ্জরীকে তিনি বিয়ের প্রস্তাব দেন। তার কাছে পৌরুষের পরিচয় দিতে নিজের বীরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন। তবু কাঙ্ক্ষিত সাড়া মেলে না, মঞ্জরী তাঁর উদ্দেশে প্রেরণ করে এক নির্দয় পত্র,–

> “তারপরে যে বিশ বৎসর কেটে গেছে, রায়রায়ান। যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সম্ভবত আয়নায় চেহারা দেখবার ফুরসৎ হয়নি। তাই একটা আয়না পাঠিয়ে দিলাম।”[২]

রামেশ্বর নিজের বার্ধক্যের কথা স্বীকার করলে মঞ্জরী নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ছলনা করে অনুকম্পার সুরে বলে, –

> “সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আমাকে নিয়ে আসবেন।”[৩]

ছলনা বুঝতে না পেরে মঞ্জরীর কপটতাকে প্রেম বলে মনে করেন রায়রায়ান। তাকে দেবীর মতো প্রতিষ্ঠা দিতে রামেশ্বর আজীবন সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার দিয়ে ঐশ্বর্যখচিত দেউল নির্মাণ করেন। তারপর প্রতিশ্রুতি অনুসারে রামেশ্বর মঞ্জরীকে তার পিতৃরাজ্য থেকে যথা সময়ে অপহরণ করে নিয়ে আসেন। কিন্তু মিলনের প্রতীক্ষিত লগ্নে রামেশ্বর জানতে পারেন মঞ্জরী ও মধুকর (রামেশ্বরের বৈমাত্রেয় ভাই) পলাতক। জানা যায়, মধুকরের সঙ্গে মঞ্জরীর বাগদান পর্বও ইতিপূর্বে সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্কিমের চঞ্চলকুমারী বলেছিল, –

> “যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুতকন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বল যুবাকে রাজপুতকন্যাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।”[৪]

কিন্তু মঞ্জরীর কাছে বাহুবলের থেকে যৌবন বড়। তাই শক্তির প্রাচুর্যে গড়া রায়রায়ানের বার্ধক্যের দেউলে মঞ্জরীর যৌবনপ্রেম অধিষ্ঠিত হয়নি।

ভালোবাসা শর্তহীন, তাই এতে কোনো দেনা-পাওনা লাভ-লোকসানের হিসেব থাকে না। এমনকি প্রিয় মানুষটি জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও অনুভবে সে বেঁচে থাকে অন্তহীনভাবে। এটাই প্রেমের ধর্ম। ‘বাদাবনের গান’ গল্পে এই আমৃত্যু বেহিসেবি প্রেমের কথা বলা বলেছে। আলোচ্য গল্পে উমেশ দয়াময়ীর প্রেম পায়নি, কিন্তু তাকে ভালবেসেছে আজীবন। গল্পের নায়ক উমেশ সম্পর্কে লেখক বলেছেন, –

> “উমেশ শিক্ষিত ব্যক্তি অ-আ ক-খ এবং ধারাপাতের আধাআধি মুখস্থ। কিন্তু হিসাবপত্রের ঘোরপ্যাঁচে মন যায় না।”[৫]

এই বেহিসেবি স্বভাব তার প্রেমের মধ্যেও নিহিত। সে নৌকা বায় আর মাঝে মাঝে গান গায়। দয়াময়ীকে খুশি করতে সে সঙ্গীতে উন্নতি করতে চেষ্টা করে। তার জীবনে একচ্ছত্র নায়ক হতে চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে ফটিকের প্রতি তার ঈর্ষা জাগে। দয়ার বিপদ আশঙ্কা করে বিদেশিকে মন দিতে সে নিষেধ করে। ফটিকের চরিত্র সম্পর্কে সে তাকে বলে, –

> "গাঙে-খালে নৌকো মেরে বেড়ায়, বে-পাশের বন্দুক নিয়ে মানুষও মারে। আদর-কাওরানির হাতনেয় বসে তামাক খায়, ফুসফুস-গুজগুজ করে তার সঙ্গে।"[৬]

কিন্তু দয়া তা শোনে না। উমেশের সঙ্গে বচসায় ফটিক অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলে একদিন গভীর রাতে দয়া সন্তর্পনে উমেশের বাড়ি এসে ফটিক সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ করে উমেশকে বলে, –

> "পুরুষজাতের মুখ মিষ্টি – তোমরা আমাদের কাদার মতন শুধু কেবল পায়ে চটকে যাও।"[৭]

তা সত্ত্বেও দয়া উমেশের সঙ্গে দেশান্তরী হয়ে যাওয়ার এক 'আশ্চর্য কথা' বলে। কিন্তু মাসির বাড়ির নাম করে সে উমেশকে নিয়ে পৌঁছয় ফটিকের ঘরে। ফটিকের ঘরনি হয়ে ফটিকেরই হাতে প্রাণ যায় তার। দয়ার প্রেম পায়নি উমেশ, তবুও –

> "উমেশের কিন্তু রাগ নেই। চোখে জল আসে তার কথা ভাবলে। মোহমুগ্ধ দয়া—সে তো পাগল তখন। পাগলের উপর রাগ করা চলে না।"[৮]

দয়ার প্রতি মমতা বোধ করে সে, সান্ত্বনা খুঁজতে চায় তার প্রতি নিজের অবহেলিত প্রেমকে অবলম্বন করেই। সে ভাবতে থাকে ফটিক যখন দয়ার গলা টিপে শ্বাসরোধ করেছিল, সেই মৃত্যুর মুহূর্তে "চকিতে একবার মনে এসেছিল কি ওমশার কথা – আকৈশোর যে ওমশাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এসেছে, মানুষ বলে মনে করেনি বেনেপোতার সেই এক মনোরম রাত্রি ছাড়া।"[৯] বাদাবনের অনন্য প্রেম মৃত্যুতেই শেষ হয় না, –

> "বাদাবন তোমাদের মানষেলার মত নয়, তোমাদের বাঁধা হিসাব সব সময় খাটে না সেখানে। কেউ মরলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি সকল সম্পর্ক চুকে গেল, এ রীতি সেখানকার নয়। ...যে কেউ অপঘাতে মরেছে মৃত্যুর অতীত হয়ে নির্জন বন-অঞ্চল জুড়ে আছেন।"[১০]

দয়ার মৃত্যুর কুড়ি বছর পরেও উমেশের প্রেম তাই বেঁচে থাকে, দয়ার 'তারিফ' পাবার আশায় স্রোতের কিনারায় দাঁড়িয়ে তাই সে তার ভাঙা হৃদয়ের গান গায় – 'হইল বড় জ্বালা রে।' বাদাবনের মাটিতে উমেশের এই প্রেমগীতি বস্তুগত সিদ্ধিতে নয়, বেহিসেবি ভাবসম্পদে ঋদ্ধ।

নর-নারী পরস্পরের প্রেমবন্ধন স্বীকার করলে তখন তা আর একমুখী থাকে না, দ্বিমুখী হয়। 'চক্ষু চিকিৎসা' গল্পে এরকম প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে মাধুরীর বাল্যপ্রেম দাম্পত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সার্থকতা পেতে চেয়েছে। আলোচ্য গল্পে গোপীকান্ত সুবিধাবাদী মানসিকতায় তার ছেলে নিরঞ্জনের সাথে তারাশঙ্করের মেয়ে মাধুরীর বিয়ের সম্বন্ধ অনেকটা এগিয়ে রেখেছে। এই সম্বন্ধে কোনো সম্মতি না থাকলেও মাধুরী মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। তাই তারাশঙ্করের চোখের চিকিৎসা করতে নিরঞ্জন বাড়িতে এলে মাধুরী তাকে এড়িয়ে চলে। গল্পের পরবর্তী অংশে জানা যায় বাল্যসাথী নিখিলকে সে মনে মনে ভালোবাসে। তাই চিকিৎসা ভালো হচ্ছে না এই অজুহাতে পিতার অনুমতি নিয়ে 'ডাক্তার' নিখিলকে আসার জন্য সে টেলিগ্রাম করে। নিখিল এলে ছেলেবেলার প্রীতি-সম্পর্কে উভয়ের নিবিড় মেলামেশা গোপীকান্তের ভালো লাগে না। একদিন তাই সে কৌশলে নিখিলকে ডেকে মাধুরীর সাথে নিরঞ্জনের সম্বন্ধের কথা জানায় এবং মাধুরীর সাথে তাকে মেলামেশা করতে নিষেধ করে। গোপীকান্তের কথায় নিখিল অপমানিত বোধ করে তারাশঙ্করের বাড়ি থেকে চলে যাবে বলে স্থির করে। অব্যক্ত ভালোবাসা তখন নিরুপায় ভাবে নিজেকে প্রকাশের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, –

> "মাধুরী তখন একেবারে ভেঙে পড়ল— রাগ করে যাচ্ছ? আমায় ভাসিয়ে দিয়ে? আমি যে কিছু বলতে পারিনি— কত কথা রয়েছে, বুক ফেটে মরে যাচ্ছি— ।"[১১]

বাল্যপ্রেমের এই অস্ফুট অথচ তীব্র প্রকাশ গল্পের শেষে বৈবাহিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

যুবক-যুবতীর পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ মেলামেশায় প্রেমের স্ফূরণ ঘটে। নিজেদের অনুভূতির কথা তখন তারা একে অপরকে কোনোভাবে জানালেও পরিবারের লোকজনকে জানানো কঠিন হয়ে ওঠে। তাই বিয়ের জন্য অন্যত্র সম্বন্ধ স্থির হলে পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে। পরিস্থিতির এই জটিলতা ও তা থেকে উদ্ধারে প্রেমের ভূমিকা – এই নিয়ে 'পোস্টমাস্টার' গল্প। গল্পে দেখা যায় কলকাতার ছেলে সুধাংশু এক গ্রামে পোস্টমাস্টার হয়ে এসেছে। সেখানে তার

সাথে শোভার আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ঝাঁপা নামক স্থানে শোভার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়। অনিচ্ছুক শোভা পোস্টমাস্টারের সাহায্য নিয়ে পিতৃ ও পাত্রপক্ষের পত্র-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। পণলোভী পাত্রপক্ষের সাথে মান-অপমানে সম্বন্ধ ভেস্তে যায়। শোভার বাবা বনমালী খোঁজখবর নিয়ে আসল ব্যাপার বুঝতে করেন। কিন্তু তিনি রাগ করেন না। বরং খুশিমনে মেয়ের সাথে সুধাংশুর বিয়েতে সম্মতি দেন। আসলে সব বাবাই চান তাঁদের মেয়েদের মঙ্গলময় জীবনের উদ্দেশ্যে সুপাত্রে সমর্পণ করতে। সেই পাত্র যদি মেয়ের স্বনির্বাচিত হয় তবু তাকে সাদরে মেনে নেন। এই উদার মান্যতায় মিষ্টি প্রেম মিষ্টতর হয়ে উঠেছে বর্তমান গল্পে।

সমাজে প্রচলিত দৃষ্টি অনুসারে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন যুবকদের সুপাত্র বলে বিবেচনা করা হয়। তাই কন্যা বা তার পিতামাতা এমন পাত্র পেলে আনন্দিত হন। কিন্তু সবার পছন্দ এক নয়। কেউ কেউ থাকে যারা তথাকথিত শিক্ষা বা অর্থনৈতিক অবস্থার ধার ধারে না। তারা তাদের জীবনসঙ্গী হিসেবে চায় চাবুকের মতো পৌরুষযুক্ত বেপরোয়া পুরুষকে, যারা ছকভাঙা জীবনের মানুষ। ‘চাবুক’ গল্পে দামিনী এই ভাবনায় কানাইয়ের ঐশ্বর্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলাইয়ের পৌরুষকে ভালোবেসেছে। কৈলাস মোড়লের দুই ছেলে কানাই ও বলাই। এদের মধ্যে দামিনীর বাবা মাদারের বলাইকে যতটা অপছন্দ, কানাইকে ততটাই বেশি পছন্দ নিজের মেয়ের পাত্র হিসেবে। কানাই সম্পর্কে তার ধারণা, –

> “ওরকম ছেলে তাদের সমাজে নেই, এ তল্লাটের ভিতরে তো নেই-ই।”[১২]

কানাই শিক্ষিত এবং ‘বাপের জমিজমা’ এখন সব তারই। অন্যদিকে বলাইকে সে ‘বজ্জাত’ ভাবে। তাই কানাই সম্বন্ধের প্রস্তাব পাঠালে মাদার এক বাক্যে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু দামিনীর বিয়ে দেওয়ার আগেই মাদার মারা যায়। কানাই পূর্বসূত্র ধরে একদিন বিয়ের ব্যাপারে দামিনীর বাড়ি এলে দামিনী তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। গ্রামের মানুষ কানাইকে বলপূর্বক বিয়ে করার পরামর্শ দিলে বলাই উদ্যোগী হয়ে দামিনীকে বেঁধে নিয়ে আসে তার কাছে। দয়াবশত কানাই তাকে বন্ধনমুক্ত করলে বলাইয়ের কাছ থেকে বহুদিন আগে পাওয়া চাবুক দিয়ে কানাইকে সে অপ্রত্যাশিতভাবে মারতে থাকে। কানাইয়ের সর্মথকরা দামিনীকে শায়েস্তা করতে লাঠি ধরলে আত্মরক্ষার জন্য সে বলাইকে আঁকড়ে ধরে। বলাই তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে ঘোড়ায় তুলে বাড়ি পৌঁছে দিলে দামিনী বলে, –

> “তোমার বাড়ি চলো যাই। এ বাড়ি একা থাকব না, ভয় করে।”[১৩]

শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন কানাইয়ের সমৃদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করে দামিনী চেয়েছে বলাইয়ের বেপরোয়া পৌরুষকে। পূর্বালোচিত ‘চক্ষু চিকিৎসা’ ও ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে আমরা দেখেছি মাধুরী ও শোভা পরিবার-নির্ধারিত বিবাহসম্বন্ধে অস্বীকৃত হয়ে নিজেরাই পাত্র নির্বাচন করেছে। আলোচ্য গল্পটি এ ক্ষেত্রে আরেকটি সংযোজন। তবে পছন্দের মাত্রাভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘মণিহারা’ গল্পে লিখেছেন, –

> “সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে।”[১৪]

স্বামীনির্ণয়ে নারীমনস্তত্ত্বের এই রহস্য দামিনীর মধ্যে ঝিলিক দিয়েছে বেশি।

প্রেমের রূপ ধরে থাকা প্রেমহীন ভাবনাকে নিয়ে মনোজ বসু কিছু গল্প লিখেছেন। এই গল্পগুলিতে প্রেম মিথ্যার আশ্রয়ে সংগঠিত, স্বার্থসিদ্ধিতে নিয়োজিত ও আত্মকেন্দ্রিক ভাবনায় পরিচালিত হয়েছে। ‘ললাট-পাঠ’ এই শ্রেণির একটি গল্প। এই গল্পে ভণ্ড প্রেমের বিষের প্রদাহ ও তার উল্টোদিকে প্রকৃত প্রেমের অমৃত স্বাদ উভয়ই পরিবেশন করা হয়েছে। এই গল্পে সমীরণের প্রেম স্বার্থদুষ্ট। অফিসের সেক্রেটারি পদে উন্নীত হয়ে সমীরণ অফিসে প্রচার করে তার এই প্রাপ্তির পিছনে ভৃগুচরণ জ্যোতিষার্ণবের পরামর্শ আছে। কিন্তু ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মেয়ের সঙ্গে সমীরণের বিয়ে স্থির হলে রহস্য বুঝতে শুক্লার কিছু বাকি থাকে না। ভৃগুচরণের কাছে সে অশ্রুকণ্ঠে সমীরণের আসল বৃত্তান্ত ফাঁস করে, –

> “সেক্রেটারি হয়েছে নিজের কোনো গুণে নয়। খাঁদা বোঁচা মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করে। পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ, এখন বুঝতে পারছি।”[১৫]

পদোন্নতির উদ্দেশ্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মেয়েকে বেছে নিতে গিয়ে সমীরণ শুক্লাকে যেভাবে ত্যাগ করেছে তাতে তার স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়। এই সমীরণেরই বিপরীত চরিত্র ভৃগুচরণ। শুক্লার ভাগ্যগণনা করে ভৃগুচরণ একসময় বলেছিল সে রাজরানী হবে। শুক্লা সমীরণের কাছে প্রতারিত হলে ভৃগুচরণের গণনাও সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবু ভৃগুচরণ শুক্লাকে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 63 - 69
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার ভবিষ্যতের ওপর আস্থা হারাতে দেয় না। শুক্লা তার স্বার্থগন্ধহীন মেলামেশায় মুগ্ধ হয়ে তাকে মহারাজার সম্মান দিয়ে বলে, –

> "অন্য রাজা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, আপনিই বরাসনে বসে পড়ুন।"[১৬]

সুযোগসন্ধানী মিথ্যাচারী প্রেমের বিপরীতে বিশ্বাসকেই ভালোবাসার 'ললাট' হিসেবে দেখানো হয়েছে এই গল্পে।

প্রেম হল নরনারীর সুখ-দুঃখ-বিপদে পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার। আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মনে প্রকৃত প্রেমের জন্ম হয় না। তাদের প্রেম বাকসর্বস্ব মিথ্যা আবেগ। ফাঁপা কথার ইন্দ্রজালে নিজের প্রেমকে অমর বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা। তাই সেই প্রেম যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন তারা কর্তব্য ভোলে। কেবলমাত্র নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারলেই তারা আনন্দিত। এই বিকৃত আনন্দের কথা উঠে এসেছে 'কী আনন্দ!' গল্পে। এ গল্পে তমালের প্রেম প্রকৃত প্রেমের ধারণা থেকে বহু দূরবর্তী। ঈপ্সিতা রত্নার মন পেয়ে সহকর্মী তমাল আনন্দে আত্মহারা হয়। অফিস-শেষে তাই সে রত্নাকে নিয়ে ঘুরতে বের হয় রাতের শহরে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে তমাল বলে, –

> "বড় বেশি আনন্দ হলে চায়ের সঙ্গে ভালো জিনিস খাই। চাকরি যেদিন পাকা হল, সেদিনও খেয়েছিলাম।"[১৭]

অতঃপর রেস্টুরেন্টের কর্মচারীকে দু'কাপ চায়ের সাথে দু'টো চিকেন কাটলেট নিয়ে আসার হুকুম দেয়। তমালের আনন্দ এখানেই শেষ হয় না। নির্জনতা উপভোগ করতে সেখান থেকে তারা গঙ্গার ঘাটে যায়। নৌকায় চড়ে তমাল সৃষ্টি করে বেহিসেবি আবেগ, –

> "ডুবে মরব একসঙ্গে। কোনদিন হয়তো জেলের জালে জড়িয়ে উঠব। তখন মানুষ নই – কঙ্কাল দু'খানা। কঙ্কালে কঙ্কালে জড়িয়ে আছি। মানুষ ভিড় করে দেখছে। আজকের এই রাত্রির পর মৃত্যুও আমাদের আলিঙ্গন ছিঁড়তে পারবে না।"[১৮]

কাহিনির এই অংশ পর্যন্ত তমালের প্রেমকে যত গভীর বলে মনে হয়, পরবর্তীতে তার কৃত্রিমতা ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই রাত্রে নৌকা থেকে নেমে দুজনে ময়দানে একসাথে পথ চলার সময় মোটরের ধাক্কায় রক্তাক্ত রত্না ছিটকে পড়ে। তমাল মানবিকতার ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে রত্নাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ফেলে চম্পট দেয়। রত্নার জীবন নিয়ে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্নতা দেখা যায় না, দেখা যায় না নিজের হৃদয়হীনতার প্রতি আত্মগ্লানিও। বরং নিজে যাতে সমস্যায় না পড়ে সে শুধু সেই কথাই ভাবে। অবশেষে রত্না যখন মারা যায়, দুর্ঘটনার রাতে তার সাথে তমালের সংস্রবের কথা কেউ জানতে পারে না, তখন সে আবারও পূর্বানুরূপ 'বড় বেশি আনন্দ' পায়। নিশ্চিন্ত মনে সেই আনন্দ উদযাপন করতে অভ্যাসবশত চাকরকে ডেকে সে চায়ের অর্ডার দেয়, –

> "ডবল-কাপ আনবি। আর চিকেন-কাটলেট।"[১৯]

নাগরিক জীবনের বুকে আত্মকেন্দ্রিক বাকসর্বস্ব প্রেমের অন্তঃসারশূন্য কঙ্কালকে লেখক সার্থকভাবে উদ্ভাসিত করেছেন এ গল্পে।

মনোজ বসু বেশ কিছু গল্পকে আদ্যন্ত প্রেমের গল্প করে তোলার সুযোগ পেলেও ইচ্ছাকৃত অবহেলায় তাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। ফলে প্রেমের আবহে রচিত সেই সব গল্প শেষ পর্যন্ত অ্যান্টি-রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। 'অভিভাবক' এই শ্রেণির গল্পগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। এই গল্পে কলেজ-ছাত্রী প্রীতিলতা পুজোয় বাড়ি যাওয়ার জন্য স্টেশনে এলে ভিড় দেখে দিশেহারা হয়। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে অপরিচিত সহযাত্রী অবিনাশ। টিকিট কাটার পর অবিনাশ প্রীতিলতার সম্মতিতে ঘন্টা চারেকের জন্য তার অভিভাবকের পদ পায়। এর সুবাদে টোপর ও অন্যান্য সরঞ্জাম সহ প্রীতিলতাকে নিয়ে ভাবী-দম্পতির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রীদের মধ্যে অনুকম্পা সৃষ্টি করে ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে ওঠা, বসা, শোওয়ার স্থান সংগ্রহের পাশাপাশি জিনিসপত্র রাখার সুচারু বন্দোবস্তটুকুও সে যেভাবে করে তা বিস্ময়কর। এখানেই শেষ নয়। ট্রেন থেকে নেমে নিজের দশকর্মা ভান্ডারের জিনিসপত্রকে টিকিট কালেক্টরের সন্দেহ থেকে বাঁচাতে পুনরায় সে দাম্পত্যের নিপুণ অভিনয় করে। দাম্পত্যের দীর্ঘ অভিনয়ে প্রীতিলতার মনে রোমান্সের দখিনা হাওয়া লাগলেও অবিনাশের মধ্যে কোনো বিচলন দেখা যায় না। তাই বিদায়বেলায় প্রীতিলতা যখন সৌজন্য দেখায়, অবিনাশ তখন প্রত্যুত্তরে আশ্চর্যভাবে উষ্ণতাহীন নিস্পৃহ আচরণ করে। যে মেয়েটির সাহচর্য নিয়ে সে গন্তব্যে পৌঁছালো তার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে এতটুকু চিন্তাও আর

দেখা যায় না তার মধ্যে। সে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। আসলে অবিনাশের মতো পাটোয়ারি বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে প্রয়োজনই শেষ কথা। তা ফুরিয়ে গেলে অন্তর বা আন্তরিকতার কোনো মূল্য থাকে না তাদের কাছে।

আভিজাত্যের অভিমানে 'সুভদ্রা' গল্পে সুভদ্রার প্রেম অ্যান্টি-রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। সুভদ্রা উচ্চশিক্ষিতা ও বনেদি বাড়ির মেয়ে। বনেদিয়ানার গর্বে কোনো পাত্রকেই তার 'যোগ্য' বলে মনে হয়নি। তাই সে অবিবাহিতা। স্কুলমাস্টার হিসেবে গল্পকথক এক সময় তাদের বাড়িতে আশ্রিত ছিলেন এবং তার রুক্ষ মেজাজের কাছে বারবার অপদস্থ হয়েছেন। পরবর্তীকালে কথককে তাঁদের আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়। এর পাঁচ বছর পরে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পুনরায় উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। মামলায় হাজিরা দিতে যাওয়ার পূর্ব রাত্রে পরিস্থিতির বিপাকে পড়েন তাঁরা। স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয়ে হোটেলের একই কক্ষে থাকতে হয় তাঁদের। সুভদ্রা মামলার প্রতিপক্ষ হলেও গল্পকথক সেই রাত্রিতে তার মধ্যে খুঁজে পান এক অচেনা নারীকে, –

> "ঘুম ভেঙে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কে। ...এই কোমল হাত সুভদ্রার, এমন আলগোছে সে হাত বুলাতে জানে!"[২০]

গল্পকথক অবাক হলেও কোনো ভাবে এই গোপনীয়তাকে অপ্রস্তুত করে তোলেননি। এই ঘটনা মনে করায় শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের কথা, –

> "আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্ত বুঝিলাম। যে গোপনেই আসিয়াছিল তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।"[২১]

সুভদ্রার প্রেমময় পরিচয় তার রূঢ়তার রূপান্তর নয়, বরং এক স্বতন্ত্র রূপ। গোপন ভালোবাসা ও বনেদিয়ানার বংশগত উগ্রতা – এই উভয় রূপের বিরল সমাবেশ ঘটেছে তার চরিত্রে। তাই পরদিনই তার মধ্যে আবার পুরাতন আভিজাত্যের গর্বকে জেগে উঠতে দেখি। সুভদ্রার আর্থিক অনটনে তাকে সাহায্য করতে গল্পকথক যখন নিজের স্ত্রীর অলংকার সুভদ্রার চোখের আড়ালে কক্ষের মধ্যে রেখে বিদায় নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হন, সুভদ্রা তখন পরিচিত স্বভাবে গর্জে ওঠে, –

> "এস্টেটের চাকরের মেয়েকে বাবা দান করেছিলেন – সে-জিনিস ফেরত দিচ্ছেন, এতদূর আস্পর্ধা?"[২২]

নারীর স্বাভাবিক প্রেমসত্তা এখানে আভিজাত্যের অহংকারে চাপা পড়ে গেছে।

সমগ্র আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'ললাট পাঠ' ও 'কী আনন্দ'র মতো দু-একটি স্বার্থ-দুষ্ট গল্প ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে মনোজ বসু প্রাক্-বিবাহ প্রেমের যে রূপ অঙ্কন করেছেন তা সুস্থ, স্বাভাবিক ও সদর্থক। প্রেমের সমাজসম্মত রূপের প্রতি আস্থা থাকায় পরকীয়া বা অন্যান্য বিপথগামিতায় লেখকের কোনো কৌতূহল চোখে পড়ে না। অসামাজিক প্রণয়ের ছবি আঁকেননি বলে তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকারাও সামাজিক সংস্কারের দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আসলে কোনো সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার দ্বারা প্রেমের স্বচ্ছ সরোবরকে ঘোলাটে করে তুলতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না। প্রেমের মুক্ত বেদীতে হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁর গল্পে প্রেমের পথে বাধা কখনোই মুখ্য হয়ে প্রেমকে গৌণ করে তোলেনি। ফলে তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে ফুরফুরে প্রজাপতির মতো নির্ভার, অথচ সুন্দর — যা মনের আনন্দে উড়ে বেড়িয়েছে প্রেমগোলাপের এক ডাল থেকে অন্য ডালে — কাঁটার আপত্তি কোথাও তাকে বিড়ম্বিত করেনি।

Reference:

১. চৌধুরী, ভূদেব, সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃ. ১০১

২. তদেব, পৃ. ২১৮

৩. পৃ. ২২১

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, রাজসিংহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ. ৯৯

৫. চৌধুরী, ভূদেব, সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃ. ৪১০

৬. তদেব, পৃ. ৪১৮
৭. তদেব, পৃ. ৪১৯
৮. তদেব, পৃ. ৪২১
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. চৌধুরী, ভূদেব, সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃ. ৩৭৫
১২. বসু, মনোজ, খদ্যোত, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ. ৫২
১৩. তদেব, পৃ. ৫৮
১৪. পাল, প্রশান্তকুমার, সম্পাদিত, গল্পসমগ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৪১০, পৃ. ৩৮৪
১৫. চৌধুরী, ভূদেব সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃ. ৭২
১৬. পৃ. ৭৩
১৭. পৃ. ১২৬
১৮. পৃ. ১২৭
১৯. চৌধুরী, ভূদেব, সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃ. ১৩০
২০. চৌধুরী, ভূদেব, সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃ. ৩৫৩
২১. শ্রীকরুণাসিন্ধু, পালিত, সম্পাদিত, শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব, এম এল দে য়্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, প্রথম মুদ্রণ ১৩৫৭, পৃ. ১৩৯-১৪০
২২. চৌধুরী, ভূদেব, সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃ. ৩৫৫